চাঁপা ফুলের গন্ধ

অনুশ্রী চক্রবর্তী

একটা প্লেনে চেপে মা-বাবা আমাদের চার ভাই-বোনকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। আমার বয়স আট, বড়-ভাইয়ের বয়স সারে-চার, ছোট-ভাইয়ের আড়াই আর সবচেয়ে ছোট গাবলু-গুবলু বোন, পাপুর বয়স ছ-মাস। একটা বিরাট বাড়ি, রাস্তার দিকে টানা লম্বা চল্লিশ ফুটের বারান্দা। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি আর দু-পাশে বিরাট স্ট্রাকচার। মধিখ্যানে বড় বড় ঘরগুলিকে দরমার বেড়া দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। শোবার ঘর, বসার ঘর, রান্নার ঘর। ছোট্ট শহর ইম্ফল। এত ছোট শহর কোন রাজ্যের রাজধানী হতে পারে! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা রাস্তা পাওনা-বাজারের দিকে চলে গেছে। আরেক দিকে এন.এইচ.পি.সি-র কোয়ার্টার। আর, বাড়ির পেছন-দিকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেটের অফিস আর কোয়র্টার, বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দৃষ্টি প্রসারিত করলে দু-একজন বন্দুকধারীও দেখা যায়। আরও দূরে ছায়া-ছায়া পাহাড়।

পাওনা-বাজার মেয়েদের বাজার। মেয়েরা পণ্য সাজিয়ে সাজিয়ে বসে থাকে। বেশ বড়-সড় বাজার। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে মণিপুরি ফর্সা-ফর্সা মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে এ-দিক ও-দিক চলে যায়। মাথায় লম্বা লম্বা চকচকে টানটান চুল। সকালে স্নান সেরেই খোলা চুলে, কানের ঠিক পাশেই একটা চাঁপাফুল ঝুঁলিয়ে রাখে মণিপুরি মেয়েরা। এখানে এত চাঁপাফুল ফোটে! লংকা-জবার আকারের হলুদ রঙের মোটা মোটা পাপড়ি। আর কী দারুণ গন্ধ! আমার বালিকা-বেলার ঐ ফুলকেই সবচেয়ে সুন্দর ফুল বলে মনে হয়। মণিপুর মানেই একটা চাঁপা ফুলের গন্ধ।

মণিপুরে একটা বাংলা স্কুলে ভর্তি হলাম ক্লাস ফোর-এ। স্কুলটা শহরের এক প্রান্তে, বাবুপাড়ায়। মাটির দেয়াল আর টিনের চালা, সাকুল্যে ছ-সাতটা ঘর। মেঝেটাও মাটির। সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে একটা বড় গাছ। ছোট্ট আমি — রোগা-পাতলা, শান্ত-শান্ত, কলকাতার মেয়ে, মুখে অন্য রকম বাংলা ভাষা, কেতাবি বাংলা। আমাকে নিয়ে টানাটানি। অন্য মেয়েরা সিলেটি ভাষায় কথা বলে। বেশ দুর্বোধ্য। ওই দুর্বোধ্য ভাষাতেই আমার প্রতি ওদের আদর প্রকাশ করে। ছোট্ট পাখির ছানা পেলে বাচ্চারা যেমন আদর করে। বাবা-র সাইকেল চেপে স্কুলে গিয়েছিলাম প্রথম দিন। রাশভারী বাবা আমাকে অনেক যত্ন করে সাইকেলের সামনে বসিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সারা দিনে, স্কুলে বেশ কয়েকজন বন্ধু হয়ে গেল। ফেরার সময়ে একটা কান্ড ঘটল। এক সহপাঠিনী বলল, 'আমি তোমাদের বাড়ির রাস্তা চিনি'। আমি ছুটির পর গুটি-গুটি পায়ে ওর সঙ্গে চললাম। এদিকে বাবার আসার কথা। কিছু-দূর অবধি গিয়ে বুঝলাম, ভুল রাস্তায় চলে এসেছি। প্রায় কাঁদো-কাঁদো। সহপাঠিনীও বিব্রত। এমন সময়ে দেখি, বাবা সাইকেল নিয়ে

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। দৃশ্যটা ভাবলে এখনও চোখে জল আসে। সারা জীবনে বাবাকে খুব কম কাছে পেয়েছি। কখনও সেভাবে আদর করেননি। নিজের কাজ নিয়ে থেকেছেন। বাবাকে সেদিন অন্য একরকম দেখেছিলাম, অন্যভাবে পেয়েছিলাম। বাবার সেই উৎকণ্ঠা এখনও প্রাণে বাজে।

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে স্কুলে যেতাম এক বন্ধুর সঙ্গে। নাম শেফালি। কয়েকটা বাড়ির পরেই ওরা থাকত। আমার ক্লাসে পড়ত। আমার থেকে বয়সে বেশ খানিকটা বড়। ওদের বাড়িতে খুব যেতাম। ওরা সিলেটি ভাষায় কথা বলত। বুঝতে পারতাম। আমাকে খুব আদর করত ওরা। শেফালির বাবা-র ট্রাংকের দোকান ছিল। যখনই যেতাম টুং-টাং ঠুক-ঠাক শব্দ। ওর বাবা স্টিলের পাত কেটে কেটে ট্রাংক বানাচ্ছেন। ট্রাংকের গায়ে ফুল ফোটাচ্ছেন। রঙিন সব ফুল। বিস্ময়ে ট্রাংক বানানো দেখতাম। ট্রাংক তখন আমার চেতনার একটা বেশ বিরাট অংশ জুড়ে। বাড়িতে একটা বিরাট ট্রাংকে মা টাকা-পয়সা রাখতেন। দামি জামা-কাপড় রাখতেন। মা সেটা খুললেই উঁকি-ঝুঁকি মারতাম। আমি আর শেফালি স্কুল থেকে ফিরতাম একসঙ্গে। রাস্তার ধারের যে লজ্জাবতী গাছগুলো, তার পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর পাতাদের লজ্জায়-মুড়ে-যাওয়া দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরতাম। স্কুলে জুতো পরার চল ছিল না। বাড়িতে যখন ফিরতাম, এক-হাঁটু ধুলো। কী করে যে অত ধুলো উঠত পায়ে। বনশ্রীও আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ে, শেফালি যেত, ওদের পায়ে তো ধুলো উঠত না। মা-র কাছে বকুনি খেতাম।

আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে একটা সিনেমা-হল ছিল। নাম ঊষা। সিনেমা-হলের সামনেটায় সারাদিন জমজমাট। মাঝে-মাঝে মাইকে জোরে হিন্দি-গান বাজিয়ে যেত। 'কাশ্মীর কি কলি' বা 'যব যব ফুল খিলে'-র গান। সারা শহরের আনন্দ ঐ সিনেমার পর্দায় লুকিয়ে থাকত। আমি আর চায়না (বাড়ির কাজের মেয়ে, আমার থেকে বয়সে একটু বড়), দু-জনে মিলে সিনেমা-হলের পাশের দরজার নিচের ফাঁকটুকু দিয়ে চোখ রেখে সিনেমা দেখার চেষ্টা করতাম। কেমন লম্বা লম্বা দেখতে ছবিগুলোকে। ভাল করে বুঝতে পারতাম না। তারপর খানিক বাদে কিছুই বুঝতে না-পেরে হতাশ হয়ে ফিরে যেতাম। প্রত্যেক সপ্তাহের রবিবার, বিকেল চারটেয় একটা বাংলা সিনেমা হত। সারা ইম্ফলের বাঙালি হাজির হত ঊষা-হলে। রবিবার বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতাম, কোন কোন কাকু-কাকিমা আসছেন আর দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে আসতাম। ভাল হিন্দি-সিনেমা এলে মা আমাদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে, ঘুম-পাড়িয়ে নাইট-শো-তে সিনেমা দেখতে যেতেন। সিনেমা দেখার জন্যে মা-র মনটা ছটফট করে উঠত। কিন্তু, সিনেমা দেখতে দেখতে গানের মাঝে অথবা বিশ্রামের সময়ে বাড়ি এসে একবার দেখে যেতেন যে ছেলে-মেয়েরা ঠিক মতো ঘুমোচ্ছে কি না, ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে বসেছে কি না!

বাবা-র পক্স হল। মা-র নাজেহাল অবস্থা। একটা মশারি-বন্দী মানুষের যত্ন করা। চারটে ছোট-ছোট বাচ্চা, তার ওপর ছোট ছেলেটা ছিঁচ-কাঁদুনে। একবার কান্না জুড়লে আর

থামতেই চায় না। কোলে একটা দুধের শিশু। অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির জোরে ঐ রোগা শরীরে ঘরকন্না, বাচ্চাকাচ্চা আর বাবাকে সামলাচ্ছেন মা। বাবা সারাদিন চুপচাপ শুয়ে আছেন বিছানায়। বিদেশ-বিভুঁই। প্লেন ছাড়া যোগাযোগ করা যায় না স্বজনদের সঙ্গে। মাকে একা-ই সামলাতে হবে সব। এরই মধ্যে বার্লি জাল দিতে গিয়ে ফুটন্ত বার্লি পড়ে গেল অংশুর পায়ে। তিন সারে-তিন বছরের কচি পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। কান্নায়, অসুখে-বিসুখে, ঝুট-ঝামেলায় ভরে গেল মা-র সংসার। মা দাঁতে-দাঁত চেপে অন্ধকার-দিন কাটাচ্ছেন। দিন গুনছেন বাবা-র সেরে ওঠার। দেখতে দেখতে বাবা সেরে উঠলেন। পক্সের গুটি শুকিয়ে যাচ্ছে। খোসাগুলো বাবা একটা দেশলাই-এর বাক্সে ভরে ভরে রাখছেন। পরে জ্বালিয়ে দেবেন। অংশুর পা অনেকটাই ভাল-র দিকে। ফোস্কার ওপরের চাপড়া উঠে গিয়ে নতুন গোলাপি চামড়া দেখা যাচ্ছে। যখন ওরা দু-জন সেরে ওঠার পথে, ঠিক হল রথের মেলায় যাওয়া হবে। সামনেই রথ। মা অনেক দিন বাড়িতে আটকে আছেন। বাচ্চাদেরও মনোরঞ্জন দরকার। একটা রিক্সা ঠিক করা হল। মা আমাদের চারজনকে নিয়ে রথের মেলায় যাবেন। বাবাও উৎসাহী। যাওয়ার দিন বিকেলবেলা, নিচে রাস্তায় রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, বাবা ওপরের বারান্দায় আমাদের হাত নাড়ার জন্য রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই প্রায় রিক্সায় উঠে পড়েছি। হঠাৎ রাস্তার ওপাশে বড়-ভাই অপু দিল এক ছুট। আর তক্ষুণি একটা বড় গাড়ি এসে ধাক্কা দিয়ে ঐ পাঁচ বছরের ছেলেকে ছিটকে ফেলে দিল দশ-ফুট দূরে। রে রে করে চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে অপুকে কোলে তুলে নিল। মাথা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বাবা তো পারলে দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পৌঁছে যান নিচে। মা অসহায়ের মতো এ-দিক ও-দিক করছেন, বাকি বাচ্চাদের সামলাচ্ছেন। অপুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। মাথার এক পাশে চোট পেয়েছে। বেশ কয়েকটা স্টিচ হয়েছে। বেশি-কিছু হয়নি, এটাই বাঁচোয়া। রথের মেলায় যাওয়া হল না। এর কিছুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর মা-র চোখে জল আর বাবা-র ব্যথিত মুখ দেখেছিলাম। সেই সন্ধ্যায় জেনেছিলাম পিসিমা দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গিয়েছেন। ছোট ছোট চারটে ছেলে রেখে পিসিমা-র অকাল প্রয়াণ ঘটল। বুঝলাম বিদেশে প্রিয়জনের মৃত্যুর খবরে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করার থাকে না।

খুব রিহার্সাল চলছে। ইম্ফলের বাঙালিরা মিলে নাটক করছে। টিপু সুলতান। মা-ও অভিনয় করছেন। এক ফকিরের মেয়ে, সোফিয়ার ভূমিকায়। রোজ রিহার্সালে গিয়ে গিয়ে আমার ডায়লগ মুখস্ত হয়ে গেছে। সারা ইম্ফলের বাঙালি উদ্যোগে, উৎসাহে ফুটছে। নাটকের দিন মা একটা সাদা সালোয়ার-কামিজ পরেছিলেন, মাথায় একটা সাদা ওড়না। মা-কে একদম চেনা যাচ্ছিল না। মা-কে স্টেজে দেখে বেশ গর্ব হচ্ছিল। আবার ভয়-ও হচ্ছিল, ভুল হয়ে যাবে না তো। পরের বছর বাবা-রা শাজাহান নাটক করেছিলেন। বাবা শাহজাহান হয়েছেন, খুব মানিয়েছে বাবা-কে। সেই শাহজাহান-বাবু (বাবা-কে 'বাবু' বলে ডাকতাম

আমরা) এখনও চোখে লেগে আছে। সেবার পাওনা-বাজারে বাঙালিরা কালী-পুজো করল খুব ধুম-ধাম করে। সব্বার খবু আনন্দ। খুব খাওয়া-দাওয়া হল, বাজি পুড়ল অনেক। ভাসানের দিন লরিতে চেপে ভাসান দিতে গেলাম সবাই খুব হৈ-চৈ করতে করতে, বড়-রা চিৎকার করে বলছে — 'যাচ্ছে কারা' আর ছোট-রা গলা ফাটিয়ে বলছি — 'পাওনা-বাজার'।

বাড়ি থেকে দু-তিন কিলোমিটার দূরে একটা সিমেট্রিতে গেলাম। আশ্চর্য শান্ত পরিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ বাহিনীর সৈনিকরা সারি সারি শায়িত এখানে। প্রচুর বাঁধানো বেদী, ফলকে নাম লেখা। আমি নামগুলো পড়তে থাকলাম আর ভাবতে থাকলাম, কোথায় এদের ঘর-বাড়ি আর কত দূরে পরিজনহীন হয়ে শুয়ে আছে মাটির গভীরে। খুব শূন্য আর উদাস লেগেছিল। বিদেশ বিভুঁই-এ নিহত অত সৈনিকের পাশাপাশি শুয়ে থাকা ঐ সমাধি ক্ষেত্র-র কথা ভাবলে আজও সে রকম লাগে।

১৯৬৫ সাল, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে আমরা ইম্ফলে। শুনলাম, ব্ল্যাক-আউট। বেশ রোমাঞ্চকর। কোনও বাড়িতে কোনও আলাদা আলো জ্বলবে না। যুদ্ধ লেগেছে। শত্রুপক্ষ যে কোনও সময়ে বোমারু-বিমান নিয়ে আক্রমণ করতে পারে। সন্ধ্যার পর থেকে আলো নিবিয়ে রাখতে হবে। ভুল করে একটু আলো জ্বলে উঠলে মণিপুরিরা চিৎকার করে বলতে থাকে - 'ময়াং, আলো বন্ধ কর'। ময়াং মানে বিদেশি। স্কুলে আর বাড়িতে খুব ভাল করে শিখিয়ে দেওয়া হল, সাইরেন বাজলে কী কী করতে হবে। কী ভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে, কানে আঙুল-চাপা দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে। একটা কথা ভেবে বেশ আশ্চর্য লেগেছিল, বোম ফেলার আগে সাইরেন বাজানো হয় — যুদ্ধবাজরা এতটাই ভদ্র। একদিন শেফালিদের বাড়ি গিয়েছি সকালবেলা। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। নিমেষে চারদিকে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কে মানুষ এ-দিক ও-দিক ছুটছে। শেফালির বাবা আমাকে পেছনের একটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে দিলেন। পথে সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সেই বিকট আওয়াজ হল আর ঘর-বাড়ি সব ভেঙে পড়ে গেল। কিন্তু, কিছুই হল না। পরে জানলাম, ওটা বোমারু-বিমানের সাইরেন নয়। অন্য কারণে বাজানো হয়েছে।

ঊষা সিনেমা-হলের পেছন দিয়ে একটা নদী বয়ে যেত। বয়ে যেত বলা-টা বাহুল্য। নদীতে জল প্রায় দেখাই যেত না। সেই নদীতেই অতি-বৃষ্টিতে বন্যা হল ইম্ফলে। ভাবাই যায় না। নদী ভেসে গেছে। বাড়ির সামনে জল দাঁড়িয়ে আছে। বাবা কলকাতায়। মা আমাদের খিঁচুড়ি রেঁধে খাওয়াচ্ছেন। চার ভাই-বোন মা-র আঁচলের তলায়। আমাদের আর কী - যুদ্ধই বা কী! ব্ল্যাক আউটই বা কী! আর বন্যাই বা কী! বন্যার খবরে পেনের টিকিট কেটে এক সন্ধ্যায় বাবা বাড়ি ফিরে এলেন। বৌ-ছেলে-মেয়ের জন্য উৎকণ্ঠায় আর এক-মুহূর্তও কলকাতায় থাকতে পারেননি। সেদিন বাবাকে পাজামা পরে, জল ডিঙিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়ি ফিরতে দেখেছিলাম। আমার কঠোর বাবার কোমল রূপের কথা মনে পড়লে আজও

চোখে জল আসে। পুরুষদের এইসব কোমল রূপের জন্যে আমি হাজার অবমাননার কথা জেনেও পুরুষ-বিদ্বেষী হতে পারিনি।

তিনটে বন্ধুর কথা মনে আছে। শেফালি, জুলি আর বনশ্রী। বনশ্রী কালো, গোলগাল আর সুশ্রী। মাথায় চাইনিজ কাট চুল। আমিও ওর মতো চুল কেটে নিলাম বায়না ধরে। ওর বাবাও বদলি হয়ে এসেছেন। কেতাবী বাংলায় কথা বলে ও। রোজ আমাদের সঙ্গে স্কুলে যায়। কিন্তু আমার মতো ওর পায়ে এত ধুলো ওড়ে না। জুলির বাবা এয়ার-ফোর্সে চাকরি করেন। খুব পরিচ্ছন্ন, টানটান ইস্ত্রি-করা জামা, চকচকে জুতো পরে স্কুলে আসে। একদিন ওদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। খুব বড় কোয়ার্টার। ওরা ডাইনিং-টেবিলে বসে ভাত খায়। আমাদের সে সব ছিল না। বাবা আমাদের চারজনের জন্য চারটে বড় বড় পিঁড়ি বানিয়েছিলেন। আমরা স্নান সেরে, চুল আঁচড়ে পিঁড়ির উপর 'বাবু' হয়ে বসে ভাত খেতাম। জুলির মা-র মুখে অনেক ইংরিজি শব্দ। উনি আমাদের বাড়িতে বানানো কেক খাইয়েছিলেন। ঠিক হল, স্কুলে আমরা টিফিন ভাগ করে খাব। মা চিঁড়ে-ভাজা, আলুর-দম, হালুয়া-লুচি বানিয়ে দিতেন। খুব আনন্দের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতাম। এই টিফিন খেতে খেতে একদিন জানতে পারলাম, জুলির একটা খুব কঠিন রোগ আছে। প্রত্যেক মাসে ওর শরীর থেকে রক্তপাত হয়। আর, তা নাকি কোনদিনও সারবে না। এত কঠিন রোগের কথা শুনে খুব মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

মণিপুরের বিখ্যাত লেক লোক্‌তক্‌। ছবিটা যতদূর মনে পড়ে, একটা পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে এসে লেকের জল ধাক্কা খাচ্ছে। সেবার জিপ-এ চেপে লোক্‌তক্‌ গিয়েছি। পাহাড়ের গা বেয়ে যে রাস্তা উঠে গেছে, জিপে সেই রাস্তা বেয়ে উঠছে খুব আস্তে। পাহাড়ের মাথায় একটা বাংলোতে যাব। হঠাৎ জিপ-টা নিচে নামতে শুরু করল। আমাদের ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মারল পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা। প্রবল ঝাঁকুনি। অনেকেই নানা জায়গায় ব্যথা পেলাম। আমার কপালে একটা আব গজিয়ে গেল। সবাই জিপ থেকে নেমে বাকি-রাস্তা হেঁটেই উঠে গেলাম। বড়দের বলাবলি করতে শুনলাম, জিপ-এর ব্রেক ফেল করেছিল। ভাগ্যিস ড্রাইভার পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মেরেছিল। তা না হলে তো জিপ-শুদ্ধু লেকের জলে পড়তে হত।

স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী। সকলকে অংশ নিতে বলা হল। আমিও নেব ভাবলাম। বাবা-র সহকর্মী ঘোষ-কাকুর সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী ঘোষ-কাকিমা দায়িত্ব নিয়ে একটা আবৃত্তি শিখিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রশ্ন'। খুব মুখস্থ করে স্কুলে গিয়ে ক্লাস-টিচারকে শোনালাম। হল কী, সারা স্কুলে ছড়িয়ে গেল যে আমি খুব ভাল আবৃত্তি করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর-পাঁচটা ক্লাসে গিয়ে দিদিমণির চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ক্লাসের সব্বাইকে শুনিয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করতে হল। স্কুলের দিদিমণিরা আমাকে খুব আদর করলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। খুব ভাল লাগছিল, আত্মপ্রত্যয় জাগছিল। কতটা ভাল আবৃত্তি করেছিলাম জানি

না। কবিতার লাইনগুলোর নিহিত-অর্থ আমার কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না। শুধু 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভাল' উচ্চারণ করার সময়ে কী যেন একটা অনুভব করতাম। কী অনুভব করতাম তা আর এত দিন বাদে মনে নেই।

গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে ঘোষ-কাকিমার কথা ভাবলে। লম্বা, সুন্দরী, অত্যাধুনিকা। সাজলে সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখায়। বিয়ে করে ইঞ্জিনিয়ার ঘোষ-কাকু কাকিমাকে নিয়ে এলেন। বাবা ওদের থাকতে দিলেন আমাদেরই পাশের একটা ঘরে। প্রেম করে বিয়ে করেছেন কাকু-কাকিমা। কাকিমার বাড়িতে প্রবল আপত্তি। বাড়ি থেকে বিয়ে দেয়নি। পালিয়ে বিয়ে করেছেন দু-জনে। তারপর সোজা ইম্ফল। বাবা ওদের অস্থায়ী আস্তানা গড়ে দিলেন আমাদেরই একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে। এত প্রেম আমার বালিকা বয়সে দেখেছিলাম। সবসময়ে দু-জন দু-জনকে আঁকড়ে আছেন। ভালবাসাবাসিতে বিভোর হয়ে আছেন। সারা ইম্ফলের বাঙালিদের কাছে কাকু-কাকিমা একটা আলোচনার বিষয় হয়ে গেল। ওদের প্রেমের প্রতি কটাক্ষপাতও কম ছিল না। বালিকা হলেও টের পেতাম ওদের প্রেমের মাধুর্য। কাকু অফিসে চলে গেলে কাকিমা আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক আদর করতেন। দুপুরে কাকু টিফিন করতে এলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন ওরা। আমি আর চায়না দরমার ফুটো দিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম, ওরা কী করছেন। লজ্জায় পালিয়ে যেতাম আপনিই। কলকাতায় ফিরে আসার বেশ কয়েক বছর পর কাকিমাকে দেখেছি ছেলে-কাঁখে আমার বাবার কাছে আসতে। ঘোষ-কাকু না কি পর-নারীতে আসক্ত। কাকিমার অন্তত কিছু খোরপোষ দরকার। কাকু দিতে রাজি নন। কাকিমা উদ্‌ভ্রান্তের মতো। সেই রূপ নেই, সেই লাবণ্য নেই। দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তার ছাপ সারা অঙ্গে। বাবা-রা কী করতে পেরেছিলেন, জানি না। কলেজে পড়ার সময়ে মাঝে-মাঝেই কাকিমাকে রঙচঙে পোষাকে, মুখে পাউডার মেখে পঞ্চানন-তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বা গোলপার্কের দিকে হেঁটে যেতে দেখেছি। ব্যথায় বুক মুচড়ে উঠেছে, এই আমার সেই ঘোষ-কাকিমা, যিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা শিখিয়েছিলেন - যাকে আমার রূপকথার রাজকন্যা মনে হয়েছিল - বালিকা-বয়সে যিনি আমার প্রেমের মাধুর্যের পরশ দিয়েছিলেন।

এত সব কথা লিখতে বসে বুকটা মুচড়ে যায়। কবে ফেলে এসেছি সেইসব দিন। এই হাজার হাজার বছরের পৃথিবীতে ইম্ফলের ঐ বালিকার জীবন কতটুকু! কতটুকু তার ছাপ পৃথিবীর মাটিতে। কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি। কোথায় চলে যাব। কোথায় চলে গেছেন আমার বাবা! কোথায় চলে যাবেন মা! কোথায় চলে যাব আমি! এই স্মৃতিচারণ আর বেদনাবোধ রেখে দিলাম আগামীর জন্য।